সমুদ্রযাত্রা

শুচিস্মিতা সেন চৌধুরী

না, কোনও রকম পরামর্শের ধার ধারে না শর্মিষ্ঠা। রিজার্ভেশন পাওয়া যায়নি দার্জিলিং মেলে-এ। তাই তিস্তা-তোর্ষা। ওয়েটিং লিস্ট। হোক না হোক এতেই যাবে। গত একমাস ধরে প্লান করছে শর্মিষ্ঠা। আজ অফিসে কাল বাড়িতে, ব্যাঙ্কে কিংবা পোস্টঅফিসে। কোনোরকমে এক সপ্তাহের ছুটি পেয়েছে সে। এ সুযোগ ছাড়া যাবে না কিছুতেই। বাবাইয়ের স্কুলে গিয়ে যে কোনো একটা কারণ দেখাবে সে। বলবে, সাতটা মাত্র দিনের জন্য।

একটা চল্লিশের ট্রেন ছাড়ল প্রায় দুটোয়। ওয়েটিং লিস্ট-টা কনফার্ম হয়েছে। শর্মিষ্ঠার নামেই। সেকেন্ড ক্লাস। একটা সুবিধাও পাওয়া গেল অতিরিক্ত। ওপরের বার্থটা পালটে নীচেরটা নিতে পারল সে। একেবারে নিজস্ব জানালা আর আলাদা তাকের সুবিধা। কামরার এই অংশে ঐরে যারা রয়েছে, তাদের মধ্যে একজন মহিলা, একটা বাচচা আর দুজন ভদ্রলোক। কাঁচা পাকা চুল-দাড়িওয়ালা মুখ। এখনও অবধি এই ক'জনের মুখই দেখতে হচেছ বারবার।

চোখ বুঁজে একবার গোটা যাত্রাপথটাকে হিসেব করে নিতে চাইল শর্মিষ্ঠা। ভোর নাগাদ নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন, তারপর টয়ট্রেন কিংবা বাস। শর্মিষ্ঠার অবশ্য পছন্দ টয়ট্রেনই। বেশ প্রকৃতি দেখতে দেখতে-। এটা বর্ষাকাল নয়। তাই পাহাড়ে ধবস নামার সম্ভাবনাও কম। একা একা প্রকৃতি দেখার চেয়ে ভাল কাজ আর কি হতে পারে? আর এই জন্যই বোধহয় বইটা বন্ধ করতে হয় শেষ

পর্যন্ত। বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুর তখন জানালায়। দূরে ধানক্ষেত। কোথাও কোথাও জমে থাকা জল। নদীর বয়ে চলা -। একবছর আগে যখন নিউ জলপাইগুড়ি ট্রেনে চেপেছিল সে, তখন একা ছিল না শর্মিষ্ঠা। সারাটা পথ ধরে যে কত প্রশ্ন করেছে ছেলেটা। 'মা, এটা কি, ওটা কেন? আর কতদূর?' উত্তর দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল একসময় সে। কতদূর? সত্যিই কতদূর যেতে চায় মানুষ?

আজ যেন একটু বোর লাগছে। কেউ তুলতে পর্যন্ত এল না। অবশ্য, বাবাকে তো জানানো সেই শেষ মুহূর্তে। সকালবেলা। তাও ফোনে। হয়ত রাগ করেই। আগে বললে বাধা দিত ঠিক। একা যেতে বারণ করতো কিংবা রিজার্ভেশন কনফার্ম হওয়ার কথা তুলতো। বলতে গেলে কিছুটা এজন্যই এড়িয়ে যাওয়া। আসার মধ্যে আর কে? বড়জোর সায়ন, সেও তো বাইরে। ফিরতে ফিরতে এক সপ্তাহ। অবশ্য ফিরেই হয়ত খোঁজ করবে। পাশের টেবিলের সান্যালবাবু বা সরাসরি ম্যানেজারের কাছেই।

এই একটা বছর কিভাবে যে কেটেছে তার! প্রত্যেক মুহূর্তে মনে হয়েছে বাবাইয়ের কথা। কি করছে, কোথায় যাচ্ছে, কি খাচ্ছে, ঠিক মত ঘুমোচ্ছে কি না! রাতে ঘুম ভাঙলে মনে হত ও বোধহয় এক্ষুনি ডেকে উঠবে 'মা' বলে। আর হবেই বা না কেন! মনে পড়ে ওর জন্মের মুহূর্তটা? বাবাকে খবর না দিলে তো একাই—।

অরূপ তখন বাইরে। বাইরে মানে বিদেশে। পি. এইচ. ডি. করার কথা ছিল ওর। কেমিষ্ট্রি-র কি একটা বিষয় নিয়ে যেন। উচচমাধ্যমিকের পর শর্মিষ্ঠার আর কেমিষ্ট্রিতে আগ্রহ ছিল না কোনও। বটানিতে অনার্স পড়তেই বিয়ে, তারপর একবছর কিভাবে যে কেটে যায়! বিয়ের পর সবাই কেমন ভাল লাগতে থাকে। সব যেন নতুন।

বাবার নামের প্রথম অক্ষর ধরেই নাকি ছেলের নাম রাখে সবাই। তাই অঙ্কুর। শর্মিষ্ঠার কাছে অবশ্য বাবাই কিংবা বাবু।

একটা ব্যস্ত প্লাটফর্মে থামে ট্রেনটি। বাইরে দিনের আলো নেই আর। প্লাটফর্মে টিউবের সাদা আলো। ফেরিওয়ালা —

সঙ্গে বিড়ি, সিগারেট থেকে শু করে চকলেট, চা পর্যন্ত। এককাপ চা নেয় শর্মিষ্ঠা। সহযাত্রী ছোট্ট মেয়েটি একটা বিস্কুটের প্যাকেট এগিয়ে দেয় ওর দিকে। চায়ে চুমুক দেবার আগেই খেয়াল করে শর্মিষ্ঠা। গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মেয়েটি। নেবে না ভেবেও না করতে পারে না সে। আদর করার ইচ্ছে হয় খুব, যেন বাবাই-ই।

ট্রেন ছুটতে শু করলে যতদূর চোখ যায় তখন শুধু অন্ধকার। দূরে কোথাও হয়ত আলো জ্বলছে একটা। যেন দুলে ওঠে হঠাৎ। কখনও ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ হয় ব্রিজের। ওপরের ভদ্রলোক খাওয়া শু করেছেন কিছু একটা। বাচচা মেয়েটি বাবার সাথে কথা বলে যাচ্ছে অনবরত। ‘এর পর কোন্‌ স্টেশন বাবা?’ সত্যিই তো, এরপর কোন্‌ স্টেশন বাবা?’ সত্যিই তো, এরপর কোন্‌ স্টেশন? একবছর আগে এসেও ভুলে গেছে সব। সত্যি কী সহজে ভুলতে পারে মানুষ!

প্রথম এ পথে আসা ছেলেবেলায়। বাবা, মা আর দাদার সঙ্গে। শর্মিষ্ঠার তখন ক্লাস সিক্স। কত ছোট না! আর এখন। এক একসময় মনে হয় কেন ছোট থাকে না মানুষ চিরকাল? চিরকাল! চিরকাল বলে কি কথা আছে কোনও? মানে সব সময়ের জন্য?

দ্বিতীয়বার আসা বিয়ের পর। সেটা উনিশশো অষ্টআশি। অরূপ ছিল সঙ্গে। শুধু অরূপ সরকার। ওর বাবা, মা, কাকা, পিসীরা সব শিলিগুড়িতে। ওদের মত ছিল না বিয়েতে। সেজন্যই রেজিস্ট্রি ম্যারেজ — একেবারে হাতে কলমে, সাক্ষীসহ। শর্মিষ্ঠার বাড়ি থেকেও মেনে নেয়নি প্রথমে। আর মেনে নেওয়ার মত কারণও ছিল না কোনও। অরূপের তখন সম্বল শুধু গোটা কতক টিউশনি। ও যখন এম. এস. সি. পাশ করার পথে শর্মিষ্ঠা তখন ওর ছাত্রী এবং সব চেয়ে প্রিয় ছাত্রী। আর যে ক'জন পড়ত একসঙ্গে তারা ছেড়ে দেয় ইলেভেনের শেষেই। শর্মিষ্ঠা কিন্তু পারেনি। কেন সেটা তখন বোধহয় জানা ছিল না শর্মিষ্ঠারও।

ফারাক্কা আসতেই হৈ হৈ পড়ে যায় একটা। প্রথমবারও এইরকম দেখেছে শর্মিষ্ঠা। ওই বদ্ধ জল দেখার আগ্রহ এখনও একই রকম। একদিকে উপচে পড়া জল, অপর দিকে হয়ত চড়া। জলে পয়সা ফেলে অনেকেই, এমনকি নদীর দিকে তাকিয়ে প্রণামও করে। এক একসময় কি অবাক লাগে না! এই যে নদীতে পয়সা ফেলা! পুরাণ ঘাটলে হয়ত কাল্পনিক কোনও গল্প বেরোবে আর ইতিহাস ঘাটলে হয়ত কোনও অমোঘ বাস্তব। সত্যিটা তো তাই।

বাচচা মেয়েটি একবার শর্মিষ্ঠার সামনে এসে দাঁড়াচেছ, ফের ছুটছে বাবার কাছে। দুদিকের জানালা দিয়েই তার ফারাক্কা দেখা চাই। দুদিকে যে দুরকম। গতবছর বাবাইও এরকম করছিল। ‘মা, ওদিকে কত জল আর একদিকে শুকনো! কেন এরকম? এ গঙ্গার শেষ কোথায়? সমুদ্র কতদূর?’ প্রশ্নের কোনও শেষ থাকে না। সত্যিই তো, ছেলেটা সমুদ্র দেখেনি কোনওদিন। অরূপকে পাশে নিয়ে সমুদ্র দেখার ইচ্ছে ছিল খুব। আসলে যাকে ভালবাসা যায় — হয়ত সমুদ্রের মতোই, আদিগন্ত জলরাশি, জল আর আকাশ। বাবাইকে নিয়ে সমুদ্র দেখতে যাবে শর্মিষ্ঠা। এবারই। দার্জিলিং থেকে কলকাতা হয়ে দীঘা।

জলপাইগুড়িতে আসার দ্বিতীয়বার দার্জিলিং পর্যন্ত যাওয়া হয়নি আর! আর খরচের কথা চিন্তা করেই —। মিরিক ঘুরেই ফিরে আসতে হয়েছিল সেবার। আর একদিনের জন্য শিলিগুড়িতে থাকা — অরূপের বাবা, মা, কাকাদের মধ্যে। ছেলেকে পাশের ঘরে সেদিন কি যে বলেছিল শাশুড়ি, শর্মিষ্ঠা তা জানতেও পারেনি কোনওদিন। হয়ত অপছন্দের কথাই বলে থাকবে, কিংবা বকাবকি করে থাকবে ছেলেকে। অরূপ একাই, মানে ওর ভাই কিংবা বোন নেই কোনও। ওই একটা দিন দম বন্ধ করে কাটিয়েছে শর্মিষ্ঠা। এতগুলো লোকের মধ্যে মাত্র একজন পরিচিত এবং সে-ই শুধু।

বছর ঘুরতে না ঘুরতে সুযোগটা পেয়ে গেল অরূপ। ও-যে চেষ্টা করে যাচ্ছিল অনবরত, তা জানা ছিল না শর্মিষ্ঠার। সামান্য মাইনের চাকরি জুটেছিল একটা। চলে যাচ্ছিল দিনগুলি। কোনও বিষয়ে অভিযোগ ছিল না শর্মিষ্ঠার। কখনও ভুল করেও যদি বলে ফেলত কিছু আফশোষ হত পরে। অরূপ গম্ভীর হয়ে থাকলে ভাল লাগত না একদম। আর ভাল লাগত না ওর বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকা। অফিস থেকে ফিরতে দেরি হলেও বই নিয়ে বসতে দেরি হত না কোনোদিন।

দিল্লীতে একটা পরীক্ষা দেবার ছিল। অরূপকে ছেড়ে সেই প্রথম থাকা। খারাপ লাগলেও বুঝতে দেয়নি কোনওদিন শর্মিষ্ঠা। আর তখন থেকেই চাকরির চেষ্টা করে যাচ্ছিল ও। অরূপ বলেছিল একমাস। একমাস কি কম! একা একা থাকা যায় অতদিন!

বিয়ের একবছরের দিনটা পালন করা হল খুব সুন্দর ভাবে। অরূপ অফিসে যায়নি সেদিন। সারাদিন একসাথে ওরা। ব

াইরে খাওয়া- দাওয়া, সিনেমা দেখা — । রাতে ফিরে ক্লান্তি ছিল না কোনও। আসলে তার পরদিনই যাওয়ার কথা অর ূপের। সারারাত কত আদরই না করেছে অরূপ। একবারের জন্যও বই খোলেনি সেদিন, অন্ধকারের মধ্যে অনুভব করেছিল ওর শরীরের উষ্ণতা। অকল্পনীয় সে সুখ।

কত রাত হয়েছে খেয়াল ছিল না শর্মিষ্ঠার। আশে পাশে যারা ছিল ঘুমিয়ে পড়েছে সব। ট্রেন ছুটছে। সঙ্গে যা টিফিন এনেছে তারই কিছুটা খেয়ে নেয় শর্মিষ্ঠা। জানালাটা বন্ধ করতেই শব্দ হয় একটা। সমস্ত নীরবতা ভেদ করে যেন ছড়িয়ে পড়ে সে শব্দ। ঘড়ি দেখে চমকে ওঠে শর্মিষ্ঠা। বারোটা বাজছে। ট্রেনে এত রাত অবধি জেগে থাকে নাকি কেউ? টয়লেট য াবার সাহস জুটিয়ে নেয় কোনও রকমে। ট্রেনটা অস্বাভাবিক দুলছে। ছেলেবেলায় মনে হত ট্রেনটা উল্টে যাবে ঠিক। আর তার পর কি হবে ভেবে ভয় করত শর্মিষ্ঠার। মৃত্যুর নয়, একা হয়ে যাবার ভয়। আর কি আশর্চ্য দেখ, এই যে সে একা একদম, সেই ভয় তাহলে কোথায়?

ভোর হতে আর দেরী নেই। আর ঘুমোবে না শর্মিষ্ঠা। এখন ঘুমিয়ে পড়লে নামতেই পারবে না হয়ত। কেউ তো আর ডেকে তুলবে না ওকে।

গতবার দার্জিলিং মেলে-এ এসেছিল বলে এ অসুবিধা হয়নি। তবে বাবাইকে ডেকে তুলতে হয়েছিল। ওর নাকি ট্রেনে ঘুম হয় ভাল। দোলনার মত মনে হয় বার্থগুলোকে আর শব্দটাও নাকি দাণ লাগে ওর। এমনকি ট্রেন থেকে নামার পরেও সেই রেশ লেগে থাকে ওর।

বাবাইয়ের এটা সিক্স। ফাইভে ভর্তি করা হয়েছিল বোর্ডিং স্কুলে। সবার কথা দার্জিলিংই ভাল সব চাইতে। আর ওরা তো মায়ের নামে ভর্তি নিতে অপত্তি তোলেনি কোনও। জানতে যে চায়নি তা নয়, তবে মেনে নিয়েছে সব। অনেক স্কুলে তো নিতেই চাইবে না এখনও। এসব স্কুলে তাও চালিয়ে নেওয়া যায় কোনওভাবে। কিন্তু বাবাইয়ের কাছেই হার মানতে হয় শর্মিষ্ঠাকে। কলকাতায় থাকাকালীন ওর বন্ধুরা নাকি জিজ্ঞাসা করত ওকে। আর ও যখন বলতে পারত না কিছু, সমস্যাটা হত তখনই। তাই এখানে পাঠিয়ে দেওয়া। ও জানে ওর বাবা অনেক দূরে কোথাও। অনেক দূর। যেখানে শব্দও পৌঁছতে পারে না কোনো। ওকি বোঝে কে জানে! একএকসময় মনে হয় ও অনেক ভাল বোঝে সবার চেয়ে। মাকে চিঠি লিখলেও জানতে চায় না বাবার কথা। বরং কখনও কখনও সায়নের কথা লেখে। আর দাদু, দিদার কথাও।

অরূপের শেষ চিঠি আসে দিল্লী ছাড়ার আগে। ও লিখেছিল "এবার দাণ সুযোগ এসেছে। সরাসরি বিদেশ। ভাবতে পারে া! ফ্রান্স, নিউ ইয়র্ক! ওখানেই থাকব এখন। যাওয়ার টিকিট ওরাই পাঠাচ্ছে। আসার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। ভ াল থেকো।"

ভাল আর থাকতে দিলে কই! শর্মিষ্ঠার যেন তখনই মনে হয়েছিল, ও ফেরার জন্য যাচ্ছে না। ও ফিরবে না। মানুষ যা খার াপ দিকটা ভাবে, তাই কেন হয়! মাসের পর মাস দিল্লীতে থেকে এসব করেছে ও। এত কেরিয়ারিস্ট হতে পারে মানুষ! এমনকি শর্মিষ্ঠা যখন জানালো বাবাইয়ের আসার কথা, কি ভেবেছিল অরূপ? সতি না মিথ্যে! ওর অবাক হওয়া চিঠি যত্ন করে রেখে দিয়েছে শর্মিষ্ঠা।

ট্রেন যখন এন জে পি স্টেশনে থামে তখন পাঁচটা। ট্রেনের ভেতরে থেকে বাইরের জগতটাকে টের পাওয়া যাচ্ছিল না মে াটেই। যতদূর চোখ যায় হালকা কুয়াশা চারদিকে। চাদর মুড়ি দিয়ে চা হাঁকছে এক ফেরিওয়ালা। ইঞ্জিনটা ট্রেন ছেড়ে চলে যাচ্ছে লাইন বরাবর। বাচচা মেয়েটিও নামল এখানে। ওরা জলপাইগুড়ি যাবে। মানে আলাদা পথ এখন থেকে। মেয়েটির চোখে তখনও ঘুম। ওভারব্রিজ পর্যন্ত একসঙ্গেই। ও টা-টা করল শর্মিষ্ঠাকে। ছোট্ট ডান হাতটা কাঁপল আস্তে করে। তারপর মানুষের ভীড়ে হঠাৎ করেই ডুবে গেল একসময় কোথায়! প্লাটফর্মের দোকানগুলো খুলছে সবে। স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলোর বেশিরভাগই যাবে দর্জিলিং। কিন্তু টয় ট্রেন? এসময় নাকি কোনও ট্রেন নেই। সে খবর নিয়েই আসা। কিছুদূর এগিয়ে বাসস্ট্যান্ড। শেষ পর্যন্ত একটা বাসেই উঠে বসে শর্মিষ্ঠা। তাড়াতড়ি আসার জন্যই জ ানালার পাশে জায়গাটা পেয়েছে শর্মিষ্ঠা। যাত্রীও অবশ্য নেই তেমন। শীতকালে আর কে যাবে দার্জিলিং।

এবার নিয়েই আসবে বাবাইকে। ওদের ছুটি পড়ছে ক'দিন পর। একমাসের জন্য। এই একটা মাস এক সঙ্গেই থাকবে দু'জনে। দুদিন অবশ্য থাকতে হবে দার্জিলিংয়ে। একদিন শিলিগুড়ি যাবে কি? শর্মিষ্ঠার ধারণা ওদের নিশ্চয় চিঠি দেয় অর ূপ। বউ ছেলেকে ভুলতে পারে, কিন্তু মা বাবাকে?

কখন যেন চোখ লেগে এসেছিল শর্মিষ্ঠার।। বাস হিলকার্ট রোড ধরে এগিয়ে চলেছে। সামনে কুয়াশা ঢাকা পড়েছে। শীতটা যেন আঁকড়ে ধরছে ক্রমশই। বাসটাও সুন্দর খুব। পর্দাটা-টাঙানো, লাক্সারি। হিন্দি গানও বাজছে মাঝে মাঝে। জানালার বাইরে চায়ের বাগান দু'পাশে। বেড়ানোর পরিবেশই। অথচ সে আজ একা। যে একাকিত্বকে ভয় পেত একদিন শর্মিষ্ঠা, সেই একাকিত্বই কেমন সঙ্গী ওর। এখন অবশ্য অভ্যেসের মধ্যেই পড়ে এটা। বাবার কথায় এভাবে একা থাকা যায় না। তাই সায়নকে — ।

এই অফিসের চাকরিটা আট বছর পুরোনো। বাবার কে একজন পরিচিত বেরিয়ে পড়েছিল অফিসে। আর সেই থেকেই চলছে। ওরা অভিযোগ করলেও ছাড়তে বলেনি কোনওদিন। হয়ত সহানুভূতি বশতই। যদিও কাজে কোনও ফাঁকি নেই শর্মিষ্ঠার। আর কোনও অসুবিধা হলে সাহায্যও করে সায়ন। সাহায্য করে সম্মান করে কিনা কে জানে! মায়ের কথায় অবশ্য ভালবাসে ও। বাসলেই বা! আমার কি! এরকমই ভাবটা শর্মিষ্ঠার। ভালবাসা শব্দটির সঙ্গে যে বিশ্বাসও আসে সে হারিয়েছে এতদিনে। হ্যাঁ, কারও ক্ষেত্রেই খাটে না ওই শব্দটি। হয়ত বিশ্বাসেরই মাশুল গুনছে শর্মিষ্ঠা এখনও।

কুয়াশা এখন কেটে গেছে অনেকটা। রোদ্দুর ঢুকে পড়েছে জানলার কাঁচ দিয়ে। বাস এখন পাহাড়ী রাস্তায়। একপাশে খাড়া হয়ে উঠে যাওয়া পাহাড়। পাথর বেরিয়ে থাকা জায়গায় জায়গায়। কোথাও আবার ধাপ কেটে চাষ করার ছবি। টয়ট্রেনের লাইন চলে গেছে পাহাড়ঘেঁষে। মোড় ঘোরার আগে হর্ণ দেয় বাসটা। অপর দিক থেকেও কখনও ভেসে আসে একই শব্দ। অজানাকে জানার একি সুন্দর নিয়ম। তবে সব নিয়মই মানুষের জীবনে হুবহু খাটে কি?

বাবাই হয়ত স্কুলের জন্য তৈরী হচ্ছে এখন। কালো কোট-প্যান্ট-টাই। ও নাকি দাদুর মত। সায়নের কথায় "তোমার সঙ্গে মিল নেই কোনও।" তবু ভাল! দাদু মানে তো মায়ের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকা। শর্মিষ্ঠার অবশ্য নিজের মতই লাগে ওকে। এতগুলো বছর যে শুধু মাকেই চিনেছে বাবাই। বাবার যে ছবিও দেখেনি ও।

অবশেষে দার্জিলিং-এ পৌঁছায় বাস। গা গোলালেও বমি হয়নি বাসে। তবে কিছু না খেলে হতে পারে। নেমেই একটা খাবার দোকানে ঢোকে শর্মিষ্ঠা। সোয়েটার, চাদর মুড়ি দেওয়া সত্ত্বেও শীত কমতে চাইছে না। এ শীতে ছেলেটা থাকে কি করে কে জানে। আর ওকে ফেলে শর্মিষ্ঠা! এক বছর ছেলের মুখ দেখেনি ও। হয়ত লম্বা হয়েছে একটু, হয়ত রোগা! এখন সরাসরি স্কুলেই যাবে শর্মিষ্ঠা। না, তার আগে হোটেল ঠিক করতে হবে একটা। একা একা হোটেলে ওঠার কথা শর্মিষ্ঠা ভাবেইনি আগে কোনওদিন। এখন তো বাড়িতেও একা। সেই যে অরূপের সাথে গিয়ে ওঠা ভাড়া বাড়ির সেই মিত্র কুটির — এখনও সেখানেই। বুড়ো, বুড়ি ওকে ভালবাসে খুব। ওদের ছেলেও বিদেশে। বিয়ে করেছে বিদেশীনিকে। ফেরেনি আর। ছেলেরা কি এরকম?

আগে মনে হত অরূপ ফিরে আসবে এই বাড়িতেই। বাড়ি তাই আর ছাড়াও হয়নি শর্মিষ্ঠার। এত সব ঘটনার পর বাবা মায়ের কাছে যাওয়া গেলেও দাদার সংসারে থাকাটা মেনে নিতে পারে না শর্মিষ্ঠা। ফ্রান্সের কোনও ঠিকানা আর পাঠায়নি অরূপ। অবশ্য যে যোগাযোগই রাখতে চায় না তার কাছে কে আর ঠিকানা আশা করবে? যদি চিঠিতেও আরও দশ বছর অপেক্ষা করতে বলত তাতেও আপত্তি ছিল না শর্মিষ্ঠার। মানুষ এত আশা করে কেন? কেন ভুলেও ভুলতে চায় না পুরোনোকে। অরূপ অন্তত এটা জানাতে পারত যে 'এখানেই শেষ। ভুলে যাও সব।' তাও চেষ্টা করত শর্মিষ্ঠা। অন্তত ছেলেটার জন্যও যদি একবার আসত। শর্মিষ্ঠা কিন্তু ভাবতে চায় না এসব। তবু কোথা থেকে এসে জীবনের সঙ্গে জুড়ে যেতে থাকে সব। এমনকি ছেলের সঙ্গে দেখা করতেও বুক কাঁপে এখন। যদি ও আবার জানতে চায় বাবার কথা। যদি জানতে চায় কবে ফিরবে বাবা? যদি কেউ এমন কিছু বলে যা সহ্য করতে না পেরে বাবাই — । ও যে বড় হচ্ছে! তবু সব ভুলে যেতে চায় শর্মিষ্ঠা। যে নাম পাশে নেই সে যেন কোথাও না থাকে। এমনকি অঙ্কুরের সাথেও নয়।

স্কুলের ভেতরে হৈ চৈ করতে থাকা ছেলেদের মধ্যে একজন অঙ্কুর অর্থাৎ বাবাই। শর্মিষ্ঠার বাবাই। প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করতে হয় প্রথমে। অনুমতি নেওয়ার জন্য। নিজের ছেলেকে দেখার অনুমতি।

— ছেলের নাম?

— অঙ্কুর বোস।

— আপনার?

— শর্মিষ্ঠা বোস।

— কেউ একজন ডাকতে গেল বাবাইকে। অপেক্ষা করতে থাকে শর্মিষ্ঠা। কতগুলো বছর চোখের সামনে ভেসে ওঠে মুহূর্তের জন্য। সেই ইলেভেন, টুয়েলভ। অরূপের কাছে পড়তে যাওয়া। একদিন বেরিয়ে পড়া বাড়ি থেকে, তারপর একজন শুধু আনন্দ, শুধু ভালবাসা। অরূপ সরকারের চলে যাওয়ার পর পরই জন্ম অঙ্কুর বোসের। আর এরপর ন'টা বছর পেরিয়ে এই এখানে শর্মিষ্ঠা।

বাবাইয়ের ডাকে চমক ভাঙে শর্মিষ্ঠার। দরজায় দাঁড়িয়ে শর্মিষ্ঠার বাবাই। দশ বছরের অঙ্কুর বোস।

হোটেলের বুকিং ক্যান্সেল করল শর্মিষ্ঠা। এখানে পৌঁছেই ফোন করার কথা ছিল বাড়িতে। সেখানে বাবা-মা। ফোন করার কথা ভুলেই গেল সে।

বাবাই এল না কিছুতেই। বলল, ছুটির তো দেরি এখনও।

— দেরি?

— না তো কী? শীতের ছুটির এখনও মাসখানেক।

কিন্তু সাতটা দিনের জন্য কি নিয়ে আসতে পারত না শর্মিষ্ঠা? আসতে পারত না বাবাই? আসলে, আসলে — অন্তহীন অন্ধকার একটা। কীভাবে বোঝাবে সে বাবাইকে অন্ধকারের এই সমুদ্র কীভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার জীবনে, ভেসে যেতে চ াইছে না শর্মিষ্ঠা। সে তো আঁকড়েই ধরতে চাইছে, সে তো বাবা-ই।

— দীঘা যাব তোকে নিয়ে ।সমুদ্র দেখবি না তুই?

সমুদ্র দেখবে না বাবাই। পরে আসতে বলল ও। বলল, এখনও তো মাসখানেক অন্তত, স্কুলে ওর অনেক কাজ, অনেক চ ারমিং স্কুল ওর। ওর আন্টি, স্যার। কোন আন্টি, স্যার। কোন আন্টি নাকি বলেছে, তুমিও যেতে পারবে বাইরে, বলেছে অনেক দূর — যেখানে তোমার বাবা — ।

হয়ত বাবা-ই বলে থাকবে এসব। এসব অর্থে ওর বাবার কথা, মায়ের মুখ থেকে শোনা, ওর না দেখা।

জানালার পাশে জায়গা পেয়েও দেখতে ইচ্ছে করছিল না। ঘুমের জন্যই অপেক্ষা করছিল শর্মিষ্ঠা। ঘুম। ঘুমের সেই অন্ধকার। অচেতনতা। এমনকি ফরাক্কা পার হওয়ার সেই গুমগুম ধবনি শুনেও চোখ খুলল না শর্মিষ্ঠা। গভীর অচেতনতার মধ্যে ডুবে গিয়ে অন্ধকারের কোনো সমুদ্রে আছড়ে পড়ার শব্দই যেন শুনতে পাচ্ছে সে।

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com